ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর

শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক- অর্থনৈতিক জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্ট

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

ভারতের নয়া উদারবাদী আর্থিক সংস্কারের ২৫ বছর
শ্রমিকশ্রেণীর সামাজিক- অর্থনৈতিক জীবনে
সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সম্পর্কে
সমীক্ষা রিপোর্ট

প্রথম প্রকাশ :
৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রকাশনায় :
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি

প্রচ্ছদ :
সুশীল দাস

মুদ্রণে : ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা. লি:
মেলারমাঠ ○ আগরতলা
ফোন - ০৩৮১- ২৩২ -৮৪৬৮
৯৪৩৬৫৮২৪৮৬

দাম : ২০ টাকা

ভূমিকা

ভারতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি ও সংস্কারের পথচলা শুরুর ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ২০১৪ সালে এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয় যে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে নয়া উদারিকরণের প্রভাবে সংঘটিত পরিবর্তনগুলি সমীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। সুনির্দিষ্ট স্লোগান তোলা ও গণআন্দোলন সংগঠিত ও বিকশিত করতে গিয়ে যথাযথ রণকৌশল গ্রহণের প্রয়োজনেই সমীক্ষার কাজটি করতে হবে।

২১ তম পার্টি কংগ্রেসের (এপ্রিল,২০১৫) প্রস্তুতিপর্বে পলিটব্যুরো এ কাজের জন্য তিনটি সমীক্ষক গোষ্ঠী গঠন করে। নীচের তিনটি ক্ষেত্রে সমীক্ষার জন্য তিনটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়—

ক) কৃষি-নির্ভর শ্রেণীগুলির মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে

খ) শ্রমিকশ্রেণী ও এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ক্ষেত্রের রূপান্তর

গ) মধ্যবিত্ত জনগণ ও শহুরে জীবনযাত্রায় সংঘটিত পরিবর্তনগুলো

তিনটি সমীক্ষক দলই সেপ্টেম্বর, ২০১৪ সালে তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি আলোচনা করে। সেইসময় কেন্দ্রীয় কমিটি রিপোর্টগুলি গ্রহণ না করে রিপোর্টগুলিতে উল্লিখিত করণীয় কর্তব্যের কিছু অংশ ২১-তম পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্টে ও ডিসেম্বর, ২০১৫-তে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক প্লেনামের রিপোর্টে যুক্ত করে।

উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্রের ওপর নয়া উদারিকরণের প্রভাব ও সংঘটিত নানা ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে সমীক্ষক দলের রিপোর্টগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য পার্টি সভ্য-সমর্থক-গবেষক-গণআন্দোলনের কর্মীদের দিক থেকে একটা তাগাদা ছিল।

এই গণআগ্রহের প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিতে পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা সাব-কমিটি 'দ্য মার্কসিস্ট' (সংখ্যা নং ৩২/২, এপ্রিল-জুন, ২০১৬)-এ প্রকাশিত রিপোর্টগুলি বাংলায় প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

এখন তিনটি রিপোর্ট তিনটি বই আকারে প্রকাশিত হল। রিপোর্টগুলি ভাষান্তর যারা করেছেন এবং বইগুলি প্রকাশের আনুসঙ্গিক কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। কষ্টসাধ্য এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

বইগুলির বহুল প্রচারের প্রত্যাশা করি।

(বিজন ধর)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
সি পি আই (এম)

আগরতলা
৯-২-১৭

১। বিশ্ব পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের পর্যায়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার 'স্বর্নযুগের' বিপর্যয়ের পর বিশ্ব পুঁজিবাদ বর্তমানে এক দীর্ঘায়িত এবং গভীর সংকটে জর্জড়িত। এই পর্যায়ে বিশ্বজুড়ে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ লক্ষ করা যাচ্ছে যেমন, আর্থিকিকরণ, বিশ্বায়িত উৎপাদন এবং উৎপাদনে পৃথিবীব্যাপী জাল, শ্লথ উন্নয়ন, বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত পণ্যের পুনর্বণ্টন, তৃতীয় বিশ্বের উৎপাদন সংস্থাগুলির সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিকিকরণ এবং শোষণ ও অসাম্যের বৃদ্ধি। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মতো ভারতীয় কর্পোরেট সংস্থাগুলি এই নয়া উদারবাদী বিশ্বায়নের প্রভাবে দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং সেগুলির কাজকর্ম বহুজাতিক সংস্থার মতো হয়ে উঠছে। পুঁজির সঞ্চরণশীলতা এবং শ্রমের আন্তর্জাতিকিকরণ ও পাশাপাশি সঙ্কোচন নীতি ইত্যাদির ফলে মজুরি এবং শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি কমে যাওয়া বা সংকুচিত হবার দিকে চাপ সৃষ্টি করছে। যার ফলে বিশ্বজুড়ে অসাম্য বাড়ছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে রাষ্ট্রীয় সম্পদের বেসরকারিকরণ। পুঁজিপতিরা নয়াউদারবাদী অর্থনীতিকে তাদের নিজস্ব অর্থনীতি বলে গ্রহণ করেছে।

২. এই সময়ে ভারত হচ্ছে সবচেয়ে বেড়ে চলা অর্থনীতির দেশ। সাম্প্রতিক সংকটের পর থেকে ভারতের কর্পোরেট জগতের অল্প কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সম্পদের বৃদ্ধি অন্যান্য অর্থনীতির চেয়ে দ্রুততর লয়ে বেড়ে চলেছে। যদিও নয়া উদারবাদের এই পর্যায়ে পরিষেবা এবং নির্মাণ কাজ বেসরকারি কর্পোরেটের কাছে পণ্য উৎপাদনের চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। তবুও ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগের চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শ্রেণীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ পণ্য উৎপাদনের কম যুক্ত হচ্ছে (ভারতী, ইনকোসিস, এইচ ডি এফ সি ইত্যাদি) এমনকি যারা কিছু কিছু করছে তারাও পণ্য উৎপাদন না করার কাজ বাড়িয়ে চলেছে (যেমন, তথ্য, প্রযুক্তি, টেলিকম, খুচরো ব্যবসা এবং বীমা ইত্যাদি)।

৩. ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি দ্রুত কর্পোরেট প্রবৃদ্ধির সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করছে। পাশাপাশি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির উপস্থিতিও উল্লেখযোগ্য। তারা কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে কোন ভারতীয় কোম্পানিই বিদেশি মালিকাধীন হয়নি। বাজারের বৈচিত্রকে কেন্দ্র করেই মূলত বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি ভারতের প্রতি আগ্রহী। বিশ্ব বাজারের প্রয়োজনে পণ্য উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে ভারতবর্ষকে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়। বিদেশি যে অর্থ ভারতে আসছে তার চরিত্র হচ্ছে " আর্থিক"। একই সময়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশি কোম্পানি অধিগ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকিকরণের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতের পণ্য রপ্তানি বেড়েছে, কিন্তু তার চেয়ে ও অনেক বেশি মাত্রায় বেড়েছে আমদানি, কারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও বেশি করে আমদানি নির্ভর হয়ে পড়েছে।

৪. ভারতে পুঁজিবাদী বিকাশের এই পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা কমার পরিবর্তে বেড়েছে। যদি ও এই বাড়তি সংখ্যার বৃদ্ধি সংগঠিত ক্ষেত্রে বা উৎপাদনে মজুরিভিত্তিক নিয়োগে হচ্ছে না, হচ্ছে অকৃষি কাজকর্মে (নির্মাণ ও পরিসেবাসহ) যা বিগত দুই দশকে বেড়েছে। পণ্য উৎপাদনবিহীন বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্ম নিযুক্তি বাড়ছে, যদিও এই নিযুক্তদের একটা ক্ষুদ্র অংশ উচ্চ বেতনধারী বাবু শ্রেণীর কর্মচারী (হুয়াইট কলার)। অসংগঠিত ক্ষেত্রেও নির্মাণ কাজছাড়া, ৩ কোটি ৮০ লক্ষের ও বেশি শ্রমিক কৃষি কাজ বহির্ভূত বিভিন্ন নিগমের কাজের সাথে যুক্ত, যাদের মধ্যে ২ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিক সাময়িকভাবে কাজের প্রয়োজনে ভাড়া করা শ্রমিক। এছাড়াও রয়েছে আরেক ধরনের শ্রমিক, যারা বাড়িতে বসে কাজ করে কিন্তু স্ব নিযুক্ত নয়। অথচ তারা মালিকের কাজ করে। মজুরি শ্রমের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি (সংগঠিত এবং অসংগঠিত উভয়ক্ষেত্রেই) মূলত নির্মাণ ও এর সাথে যুক্ত অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেই ঘটেছে, যা বর্তমানে ভারতের মোট শ্রমশক্তির ১১ শতাংশের কাছাকাছি। ভারতের শ্রমিক বাহিনীর সংখ্যা এত বিশাল যে, তা পৃথিবীর যে কোন দেশের মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। এই অবস্থা এবং ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর এই বৈশিষ্ট্যে এখানে ঐতিহাসিকভাবে সীমিত মাত্রায় পুঁজিবাদী বিকাশ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব এই উভয়েরই প্রতিফলন ঘটেছে।

৫. কৃষির সংকট এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপের ফলে মানুষ কৃষি কাজ ছেড়ে দিয়ে শহর ও গ্রামের অকৃষি কাজে নিযুক্তির প্রশ্নে ভীড় করছে। কৃষিজীবীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে স্বনিযুক্তির সংখ্যাও কমছে এবং যারা শ্রমবিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে চায় তার সংখ্যাও বাড়িয়ে চলছে।

৬. সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্ম নিযুক্তির মাত্রা বাড়লেও বিশেষ পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে, সবার কর্মসংস্থান করার প্রশ্নে তা সীমিত। বেশির ভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্র যেমন, নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, রাস্তার হকারি ইত্যাদি উপায়ে জীবিকা নির্বাহী কাজে যুক্ত হচ্ছে। গ্রাম থেকে শহরে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে বিরাট সংখ্যায় স্থানান্তর ঘটছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থানান্তর এবং বেশি সুযোগ সুবিধার আশায় দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়াও বেড়েছে। বিরাট সংখ্যার শ্রমিক বছরের একটা সময়ে কাজের সন্ধানে ভিন্ন রাজ্যে চলে যায়, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন ইট ভাটার শ্রমিক ইত্যাদি, কৃষি কাজের সময়ে আবার গ্রামে ফিরে আসে। আবার আরও অনেকে আছে যারা প্রতিদিন পার্শ্ববর্তী শহর বা নগরে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ পাবার আশায় দৈনিক হাজিরার শ্রমিক রূপে প্রতিদিন যাতায়াত করে। ঘরের কাজ, পরিবারের সহায়তা করার জন্য অনুৎপাদনশীল কাজ কর্মে মজুরিবিহীন শ্রমদানে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে।

৭. প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক সংগঠিত কলে কারখানার নিযুক্ত এবং সংগঠিত ক্ষেত্রে ৩ কোটিরও কম শ্রমিক নিয়মিতভাবে কর্ম নিযুক্ত রয়েছে যার মধ্যে মাত্র ১ কোটি ২০

লক্ষ রয়েছে দ্রুত বেড়ে চলা বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিতে। ১৯৯১ সালে নয়া উদারবাদী নীতি চালু হবার পর সরকারি ক্ষেত্রে ২০ লক্ষের ও বেশি কর্ম সংস্থান কমেছে, বিশেষ করে শিল্প কারখানার কাজে। অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে মাত্র প্রায় ৪০ লক্ষ এবং মূলত অনুৎপাদনশীল কাজকর্মে।

৮. বিরাট শ্রম শক্তির প্রকৃত মজুরি কমছে এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের মাত্রা বেড়েছে। উৎপাদনে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তা ঘটছে, যাতে উৎপাদনের পরিমাণ প্রচন্ডভাবে বেড়েছে কিন্তু অন্যদিকে মজুরি রয়েছে স্থির। এর ফলে আয়ের পুনর্বন্টন মুনাফা ও উদ্বৃত্ত আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মজুরি সংকোচনের ফলে তা ঘটছে। কিন্তু অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন বাবু শ্রেণীর কর্মীদের বেসরকারি ক্ষেত্রে উচ্চ বেতনে নিযুক্তি চলছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশের এই বাড় বাড়ন্ত বিশ্ব সঞ্চরণশীল আন্তর্জাতিক শ্রমশক্তির একটা অংশকে নয়া উদারবাদের প্রভাবে প্রভাবিত করতে সাহায্য করছে। কারণ সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে প্রচার মাধ্যম, শিক্ষার এবং প্রশাসনে তাদের একটা মুখ্য অবস্থান রয়েছে। যা হোক না কেন, শ্রমিক বা কর্মচারী, আয়ের বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পুঁজির ক্রমবর্দ্ধমান ভয়াবহতা এবং আরও পারদর্শিতা, আরও উৎপাদন এসব দাবির ক্রমাগত চাপে আক্রান্ত।

৯। পুঁজির এই পর্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের স্বার্থে বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রমের বিনিময়ে পুঁজির ভয়াবহতাকে আরও তীব্র করা। নিয়োগ কর্তারা উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেএবং একই সময়ে বাড়তি উৎপাদনে শ্রমিকদের প্রাপ্য অংশ নিজেদের মুনাফা বাড়ানো ও মুনাফার হার বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

১০। খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিক শ্রম আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রচলিত শ্রমকে আরও নমনীয় এবং নিয়োগ কর্তার মর্জি অনুযায়ী 'ধর এবং ছাড়' (হায়ার এ্যাণ্ড ফায়ার) নীতি প্রয়োগ করার লক্ষে পুঁজির স্বার্থে শ্রম আইনকে সংশোধিত করা হচ্ছে নয়া উদারবাদী নীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। সম্প্রতি শ্রম বিরোধ আইন, ট্রেড ইউনিয়ন আইন, এবং চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক (নিয়ন্ত্রণ ও বিলুপ্তি) আইন প্রভৃতি সংশোধন করার উদ্যোগে গতি পেয়েছে। রাজস্থান সরকার ইতোমধ্যেই সমস্ত আইন সংশোধন করে নিয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারও সেই পথে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে। এমন কি শ্রম আইন থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের ভূমিকা হচ্ছে সেই গুলিরও প্রয়োগকে যথাযোগ্য করার পরিবর্তে সে সব আইনের লঙ্ঘনকে উৎসাহিত করা।

১১. বিনিয়োগ আকর্ষণ ও উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, জাতীয় উৎপাদন ও বিনিয়োগ অঞ্চল, বিশেষ বিনিয়োগ এলাকা, রপ্তানিকেন্দ্রিক কারখানা ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে শ্রম আইনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে অথবা শ্রম আইন প্রয়োগ পরিদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করে শ্রম আইনের উল্লঙ্ঘন চলেছে। এমন অনেক উদাহরণ

আছে যে কারখানা গড়ে তোলার পর একটা সময়সীমা পর্যন্ত সরকারি আইন অনুযায়ী কর সহ অন্যান্য ছাড় ও ভরতুকী উপভোগ করে সেই সময়সীমার পরে কারখানাটিকে অন্য কোন বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কারখানার কর্মরত শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছে।

১২. নয়া উদারবাদি পর্বের আগে শ্রমিকরা আন্দোলন সংগ্রাম অথবা বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে বিধিবদ্ধ অধিকারের সুরক্ষা এবং প্রয়োগ করতে সমর্থ ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইস্পাত শিল্পে (দুর্গাপুর, ইসকো, রাউরকেল্লা, ভিলাই ইস্পাত কারখানার কেনটেইন শ্রমিক প্রভৃতি), বেসামরিক বিমান, পরিবহন (এয়ার ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ এয়ারপোর্ট অথরিটি অব্ ইন্ডিয়া), বিদ্যুৎ (হরিয়াণা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, হিমাচল প্রদেশসহ অন্যান্য কিছু রাজ্যে) সড়ক পরিবহন ইত্যাদি সংস্থায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের চাকুরি কনট্রাক্ট লেবার এ্যাক্ট (আর এণ্ড এ) এর দ্বারা নিয়মিত করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু নয়া উদারবাদি জমানায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সেইল এবং কোল ইন্ডিয়ার পুনর্বিবেচনার আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রীমকোর্ট তাদের আগের রায়ের আংশিক বাতিল করে এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মচারীদের ক্ষেত্রে যে রায় দেয় তাতে প্রমাণিত যে, নয়া উদারবাদের এই পর্যায়ে বিচার ব্যবস্থাও পুঁজির পক্ষ নিয়ে আইনের ব্যাখ্যা করছে।

১৩। নয়া উদারবাদি বিশ্বায়নের পর্বে পুঁজির স্বেচ্ছাচারকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য কিছুর সাথে আরও একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যা হলো, শ্রমিকশ্রেণীর গঠনের পরিবর্তন। বিধিবদ্ধ অধিকার ভোগ বিহীন শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে এবং বিধিবদ্ধ অদিকার ভোগকারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রচণ্ডভাবে কমে গেছে। একটা বড় সংখ্যার শ্রমিক পেশা, স্থান এবং নিয়োগ কর্তার ক্রমাগত পরিবর্তন করে চলতে বাধ্য হলেও আর্থিক অবস্থার খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটছে। শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য বাড়ানোর জন্য ভারতবর্ষে অবশ্য এই একটি আধুনিক বিষয়ই কার্যকরী নয়। তার বাইরেও জাত-পাত-ধর্ম-লিঙ্গ ইত্যাদি কলা কৌশলকেও ব্যবহার করা হয়।

১৪। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তার রূপ রেখার একটি বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

১। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকশ্রেণী :

সরকারি এবং বেসরকারি এই দুই ক্ষেত্রেই স্থায়ি শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। স্থায়ী শ্রমিকরা কাজের ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে খুবই দুর্বিষহ পরিস্থিতির সম্মুখিন, যদিও মজুরি এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সুযোগ সুবিধা তারা বেশি মাত্রায় ভোগ করছে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ বিশাল সংখ্যায় বাড়ছে। নিয়োগকর্তারা তাদের মজুরী কমানোর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করছে, পাশাপাশি স্থায়ী শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে বাধা দেয়াসহ দরকষাকষির সুযোগও কমিয়ে দেয়া হয়েছে। অল জব ট্রেইনীস্ (ও জেটি) , লং টার্ম ট্রিইনী এমপ্লয়ীজ (এল টি টি ই), ফিক্সড টার্ম কনট্রাক্ট (এফ টি সি) জুনিয়র এক্সেকিউটিভস্

ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা স্থায়ী শ্রমিকদের সম পর্যায়ের কাজ করে কিন্তু মজুরির ক্ষেত্রে স্থায়ী শ্রমিকদের মজুরির একটি অংশমাত্র মজুরি পায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জাপানি মালিকানায় কেনস্টার সংস্থার তামিলনাড়ুর শাখায় শিক্ষার্থী শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ১০৮০ জন, সেখানে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র ৭৩ জন। অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলামের রেড্ডি, ল্যাব এ পাওয়া এবং দূরশিক্ষার সুযোগ করে দেবার শর্তে সেই ল্যাবের ছাত্রদের কোম্পানিতে কাজ করতে হয়।

উৎপাদন বাড়ানো এবং শ্রমিকদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ উদ্বৃত্ত লাভের জন্য নিয়োগকর্তারা আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রায়ণ, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যন্ত্রমানব ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ শুধুমাত্র শ্রমিকদের কাজের সময় বাড়ানো এবং মজুরি কমানোর জন্য গ্রহণ করছেন। ফ্রিকোয়েন্ট টাইম এ্যাণ্ড মোসন (এফ টি এম) স্টাডিস্, ই- ম্যানেজমেন্ট, সেল্‌ফ্ ম্যানেজমেন্ট টিমস্ (এস এম টিস) ইত্যাদি সংস্থা পরিচালনা এমন কলাকৌশল অবলম্বন করছে যাতে শ্রমিকদের মধ্যে একটা মোহ তৈরি করা যায় যার ফলে শ্রমিকরা নিজেদের আর শ্রমিক বলে ভাববে না। ভাববে সংস্থারই একটা অংশ হিসাবে। অশোক **লিলেণ্ড** কোম্পানি অল টাইম ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (এ টি এম এস) পরিচালন পদ্ধতির মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যাতে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টায় ৪৮০ মিনিট কাজ করতে হয়। ফলে তারা প্রাকৃতিক কাজও করতে পারে না। এমনকি ক্লান্তি দূর করার জন্য ন্যূনতম একটু বিশ্রামের সুযোগও দেয়া হয় না। অনেক বহুজাতিক কোম্পানিতে টোট্যাল প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট (টি পি এম) পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিকভাবে শ্রমের প্রয়োজনীয় সময় ও মূল্য সচেতনভাবে কমিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে, আধুনিক সংগঠিত শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের প্রচন্ড মানসিক ও মনস্তাত্বিক চাপ এবং অপমান সহ্য করতে হচ্ছে, যদিও তারা তুলনামূলকভাবে বেশি মজুরি ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

২০১১-১২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সংগঠিত পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে যতসংখ্যক শ্রমিক কাজ করে তার ৭৭.৫ শতাংশ ভাগের নিয়োগে কোন লিখিত চুক্তিপত্র নেই, অন্য ২.৪৩ শতাংশ অংশের মাত্র ১ বৎসরেরও কম সময়ের লিখিত চুক্তি আছে। মোট শ্রমিক সংখ্যার মাত্র ১৭.৪১ শতাংশ তিন বছরের বেশি লিখিত চুক্তিপত্র আছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত ৭০ শতাংশের বেশি নিয়মিত বেতনভোগী শ্রমিকের কোন লিখিত চুক্তিপত্র নেই। মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ। ২০১১-১২ পর্যন্ত ৯১ শতাংশ মহিলা শ্রমিকের কোন লিখিত চুক্তিপত্র নেই। মাত্র ৬.৩ শতাংশ মহিলা শ্রমিকের তিন বছরের বেশি লিখিত চুক্তিপত্র আছে। ৬০ শতাংশ শ্রমিক প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, হেলথ কেয়ার ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষাগুলির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় মহিলা শ্রমিকদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ এর দশকে সংগঠিত পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক এবং পরিচালক

কর্মচারীদের মধ্যে আয়ের বৈষম্য বেড়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে শ্রমিকদের তুলনায় পরিচালন আধিকারিকদের বেতন বাড়ার পরিমাণ অনেক বেশি।

২. সংগঠিত ক্ষেত্রের অসংগঠিত অংশের শ্রমিক

নয়া উদারবাদী নীতির প্রভাবে নিয়োগের সম্পর্কের প্রশ্নে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে।। সরকারি এবং বেসরকারি এই উভয়ক্ষেত্রেই নিয়োগ কর্তা এবং বিরাট সংখ্যক নিযুক্তদের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন স্পষ্ট বা চিহ্নিত অথবা বোধগম্য কোন অবস্থাও নেই। সংগঠিত ক্ষেত্রের অসংগঠিত অংশের শ্রমিক যাদের অনিশ্চিত অবস্থায় কাজ করতে হয় নয়া উদারবাদি জমানায় তাদের কাজের কোন নিরাপত্তা নেই, আয়েরও কোন নিশ্চয়তা নেই, সামাজিক সুরক্ষা এবং আইনি সুরক্ষারও ব্যবস্থা নেই। যদিও এই শ্রমিকদের অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বলা যাবে না।

বাজারের অস্থিরতার বোঝা শ্রমিকদের দিকে বিভিন্ন চেহারায় ঝুঁকে পড়েছে, যেমন ঠিকেদারি নিয়োগ, বাইরে থেকে কাজ করিয়ে আনা ক্যাজুয়েল প্রথা, কাজভিত্তিক চুক্তি ইত্যাদি যে কাজ অনিয়মিত, দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, শিক্ষানবীশ অথবা শিক্ষার্থী এবং বাড়িতে বসে যারা কাজ করে তারা সবাই এর আওতাভুক্ত।

অসংগঠিত ক্ষেত্র সম্পর্কে ২০০৯ সালের ন্যাশনেল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজের রিপোর্ট অনুযায়ী আর্থিক সংস্কার কর্মসূচী চালু হবার পর সংগঠিত ক্ষেত্রের কর্ম সংস্থান বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত চরিত্রের হয়ে পড়েছে। অনেক সমীক্ষাতেই দেখা গেছে যে, ১৯৯০ এর দশকের প্রথমদিকে উৎপাদন শিল্পে নিয়োগের অনিয়মিত নিয়োগের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে। আরও দেখা গেছে ১৯৯২- ২০০১ এই সময়ে প্রাথমিক ও পরিচালনার সাথে যুক্ত শ্রমিকরা বাদে চুক্তিভিত্তিক এবং সাময়িকভাবে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুন বেড়েছে। শ্রম আইনের মাধ্যমে চাকুরির সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও সরাসরি নিযুক্ত নিয়মিত শ্রমিকদের জায়গায় অনিশ্চিত ও বিধিবহির্ভূত শ্রম সম্পর্কযুক্ত শ্রমিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। ২০০৩-০৪ এবং ২০০৯- ১০ এই সময়ের মধ্যে সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ৫.১ শতাংশ আর অন্যদিকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে ১২.৪ শতাংশ। সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্তিতে সর্বমোট শ্রমিকের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৯৫-৯৬ সালের ১০.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০০৯- ১০ সালে হয়েছে ২৫.৭ শতাংশ। অন্যদিকে এই একই সময়ে সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৬৮.৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫২.৪ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য যে ৫০ জনের বেশি শ্রমিক সহ বড় বড় কোম্পানিগুলিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের প্রথা আগের তুলনায় ২০০০ সালের শেষ থেকে বেড়েছে। ২০০৯-১০ সালে ৫০০০ শ্রমিকের বেশি কর্মরত মোট শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক হচ্ছে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক।

নয়াউদারবাদি জমানার আগে, যেখানে শুধুমাত্র আনুসঙ্গিকও কম দক্ষতা সম্পন্ন কাজের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ করা হতো সেখানে নয়া উদারবাদি যুগে একমাত্র উচ্চ পদে নিযুক্তি ছাড়া প্রশাসনের সমস্ত প্রায় স্তরে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে।

অনুমান করা হচ্ছে যে, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং অনেক বহুজাতিক কোম্পানিসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৭০ শতাংশএর বেশি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক কর্মরত।

মাল স্থানান্তর/ বাইরে থেকে কাজ করিয়ে নেয়া/ ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অথবা উৎপাদনের সম্পূর্ণ কাজকেই বিভিন্ন এজেন্সীর মাধ্যমে করিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে কাজের জায়গার বিকেন্দ্রিকৃত এবং ভাগ ভাগ করে দেয়া হচ্ছে। এই সব কাজ বিভিন্ন জায়গায় যেমন মিষ্টির দোকান অথবা বাড়িতে বসে করানো হচ্ছে, কিংবা এমনকি একই ছাদের তলায় বসে করলেও প্রধান নিয়োগ কর্তার সাথে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই এবং নিয়োগকর্তা ও তাদের সম্পর্কে দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে।

সম্প্রতি অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনাবেচার কাজ বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে জিনিসের চাহিদার নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনমতো শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে।

এমনকি মারুতি, হুণ্ডাই এর মতো অতি উন্নত আধুনিক গাড়ি তৈরির কারখানাতেও উৎপাদনের কাজে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বাড়ছে, যারা একই ছাদের নীচে স্থায়ী শ্রমিকদের সাথে কাজ করছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তা নিয়ে যে ধারণা রয়েছে মারুতি গাড়ি কারখানার ৫০০ স্থায়ী ও ১৫০০ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিককে চাকুরি ছাঁটাই করে দেয়া কিংবা মাইক্রো সফট্ কোম্পানি কর্তৃক নোকিয়া কোম্পানি অধিগ্রহণের পর ৮০০০ শ্রমিক ছাঁটাই এর ঘটনায় তার প্রকৃত চেহারা প্রকাশ্যে এসেছে।

ঠিকাদারি প্রথায় যথেচ্ছ নিয়োগের ফলে মুজুরির পরিমাণ ভয়ানক কমে গেছে (১৯৮০র দশকের ৩১ শতাংশ থেকে ২০০৯ এ ৯. ৫ শতাংশে নেমে এসেছে) তুলনায় মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে (একই সময়ে ১৫ শতাংশ থেকে প্রায় ৫৫ শতাংশ হয়েছে)।

৩. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক

কৃষিক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা নয়াউদারবাদি যুগে বাড়ছে। মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৯৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। এর সাথে শুধু অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা নয়, কৃষিক্ষেত্রের সাথে যারা যুক্ত তারাও রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে সংকট এবং কৃষি ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ কমে যাবার ফলে এর সাথে যুক্ত বিরাট সংখ্যার শ্রমিক শহর ও গ্রামে বাধ্য হয়ে অকৃষি কাজ করছে। ভারতে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো গঠিত ইনস্টিটিউট অব এপ্লায়েড ম্যানপাওয়ার রিসার্চ এর রিপোর্ট অনুসারে ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১- ১২ সালের মধ্যে কৃষি কাজে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৭০ হাজার কমে গেছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের কোনমতেই কৃষি শ্রমিক বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ জীবিকা নির্বাহের জন্য বৎসরের ৮ মাস তাদের কৃষির সাথে যুক্ত নয় এমন কাজ করতে হয়। ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে এদের সংগঠিত করার জন্য আরও উদ্যোগী হতে হবে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কাজ একচ ধরণের নয়। কাজের ক্ষেত্র, যেকাজ তারা

করছে সেই কাজ, তাদের দক্ষতা, লিঙ্গ, জাত-পাত, কাজের জায়গা এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর কাজের ভিন্নতা নির্ভর করে। এর সাথে যুক্ত আছে স্ব-নির্ভর, বাড়িতে বসে কাজ করা এবং দৈনিক ও মজুরিভিত্তিক শ্রমিকরাও। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কিছু কাজ যেমন বেসরকারি যাত্রী ও মাল পরিবহন যা দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, এই পরিবহনের সাথে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তাদের মজুরি অথবা কাজের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে খুব কমই আইনি নিরাপত্তা পেয়ে থাকে এবং যা ও কিছু আইনি সুরক্ষা আছে তাও বাস্তবায়িত হয়না। সমীক্ষায় দেখা গেছে ২০১১- ১২ বছরে ৯৩ শতাংশ অস্থায়ী শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার কোন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে না এবং তাদের অবস্থা দিন দিন আরও শোচনীয় হয়ে পড়ছে।

নয়া উদারবাদী জমানায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সরকারী পরিষেবাকে বেসরকারী পরিচালনায় তুলে দেবার ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে ব্যয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পক্ষে এমনভাবে বেড়ে গেছে যে অনেক পরিবারকে এরজন্য ঋণ নিতে বাধ্য হতে হবেই। সৌন্দর্যায়ন ও বস্তি পরিস্কারের জন্য তাদের শহরের প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে, যার ফলে কাজের জায়গার যাতায়াতের সময় বৃদ্ধি-সহ যাতায়াত খরচও বেড়ে গেছে। অসংগঠিত শ্রমিকদের বেশিরভাগই অস্বাস্থ্যকর এবং ঘিঞ্জি বস্তিতে বাস করে।

চুক্তি শ্রমিক এবং রাস্তার ফেরিওয়ালাদের নিয়ন্ত্রণ ও তাদের জন্য নিয়মকানুন তৈরি করার প্রশ্নে অপরাধীদের ভূমিকা বাড়ছে। বস্তিতে আবাসন তৈরি প্রশাসনিক ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের স্থানীয় জমির দালালরা সক্রিয়। এভাবে অসংগঠিত শ্রমিকরা একদিকে যেমন তাদের নিয়োগকর্তার দ্বারা শোষিত হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি তাদের বসবাসের এলাকায় এসব মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

গৃহকেন্দ্রিক শ্রমিক

নয়া উদারবাদী জমানায় ঘরে বসে বসে কাজ করার পরিমাণ বাড়ছে। এমন কি কিছু কিছু বহুজাতিক কোম্পানি তাদের কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকদের মাধ্যমে করিয়ে নিচ্ছে। এ সমস্ত কাজ ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার, দালাল অথবা মধ্যসত্বভোগীদের মাধ্যমে করানো হচ্ছে ফলে শ্রমিকরা তাদের প্রধান নিয়োগকর্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। নিয়োগকর্তার নথিপত্র কিংবা সরকারি সমীক্ষায় কোথাও ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকদের কোন অস্তিত্ব নেই। এধরনের শ্রমিক প্রধান নিয়োগকর্তার কাছে অস্তিত্বহীন, পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনের কাছেও এরা অদৃশ্য। শ্রমিক মালিক সম্পর্ক ঘোমটার আড়ালে থেকে যাচ্ছে। ফলে শোষণের মাত্রাও অত্যন্ত বেশি। নয়া উদারবাদী জমানায় তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্র এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত

কাজে এবং ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকরা নিযুক্ত হচ্ছে। যদিও তারা এক্ষেত্রের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় মজুরি বেশি পায়, তাদেরও কোন সামাজিক নিরাপত্তা নেই এবং প্রচন্ডভাবে শোষিত হচ্ছে।

ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকদের বেশিরভাগই হচ্ছে মহিলারা; কৌশল করেই এদের স্বনির্ভর বলে দেখানো হয়। তার জন্য যে সমস্ত জিনিষ নিয়ে তারা কাজ করে সেগুলিকে তাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে বলে দেখানো হয়, আবার তৈরি করা পণ্যটি তাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে বলে দেখানো হয়। উদ্দেশ্য, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার সম্পর্কটা গোপন রাখা।

মোটামুটি বলা যায়, ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকেরা কোন আইনের আওতায় আসে না। যদিও কেরালা , তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকে এদের জন্য কল্যাণকর কিছু সুযোগ সুবিধা দেবার আইন আছে, কিন্তু যা আছে তাতে সবটা পুরণ হয় না। ২০০৬ সালে সি আই টি ইউ এর তত্বাবধানে ১০টি রাজ্যের ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকদের নিয়ে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আই এল ও'র ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিক সম্পর্কিত কনভেনশনের আওতার পড়ে এমন ৮৬ শতাংশ শ্রমিক আছে এবং তারা স্ব নির্ভর নয়। সমীক্ষায় আরও পাওয়া গেছে এসব ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিকরা পরিবারের সঙ্গে এমন কি শিশুদের নিয়ে ৮-১০ঘণ্টা কাজ করে ও মাসে ১০০০ টাকার কম রোজগার করে। এতেই শোষণের মাত্রা বোঝা যায়। সাথে সাথে, মহিলারা পরিবারের অন্যান্য দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি ঘরে বসে কাজ করতে পছন্দ করে এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় মহিলারা আয়ের অন্য কোন উপায় না পেয়ে বাড়িতে বসে নিয়মিত কাজই পছন্দ করে।

স্বনির্ভর শ্রমিক

যদিও স্বনির্ভর কাজ নয়া উদারবাদের কোন অবদান নয়, তবুও দেখা যায় এই জমানায় স্বনির্ভর কাজে কর্মসংস্থান অনেক বেড়েছে। কাজের সন্ধানে শহরে এসে ভিড় জমানো বিশাল সংখ্যক গ্রামীণ শ্রমিক রিক্সা টানা, রাস্তায় হকারি কিংবা অটোচালক হিসাবে কাজ করছে। তাদের কোন উপার্জন বা সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তারা আর্থিক দুরাবস্থার কারণেই স্বনির্ভর কাজ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে, পছন্দের কাজ বলে বেছে নিচ্ছে না। বিরাট সংখ্যার মহিলা স্বনির্ভর কাজের সাথে যুক্ত এবং তারা বিনিময়ে কোন মজুরি পায় না।

প্রকল্প শ্রমিক

ভারত সরকার এবং অনেক রাজ্য সরকার গরীব জনসাধারণের উপর নয়া উদারবাদের আক্রমণের জ্বালা নিরাময়ের জন্য 'মলম' হিসাবে অনেক 'প্রকল্প' আরম্ভ করেছে। কিন্তু এসব প্রকল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যাতে ভোগ করতে না পারে সেজন্য তাদের শ্রমিক কিংবা কর্মচারীর সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হয় না। তাদের নানা নামে অবিহিত করা হয়, যেমন সমাজ সেবক, স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী,

যশোদাস, মামাতাস এবং অতিথি ইত্যাদি। এদের মধ্যে কারো কারোকে নামমাত্র 'সাম্মানিক ভাতা', 'উৎসাহ ভাতা' অথবা ' থোক বেতন' হিসাবে কিছু দেয়া হয়, অনেকে তাও পায় না। 'পরিষেবা, দেবার পরিবর্তে অর্থ সংগ্রহ করে নিতে বলা হয়। সাধারণ একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, এ ধরনের প্রায় এককোটি শ্রমিক অথবা কর্মচারী আছে।—যাদের মধ্যে বেশির ভাগ হচ্ছে মহিলারা, যারা ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প অথবা কর্মসূচীতে শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে কাজ করছে,যেমন আই সি ডি এস, এন আর এইচ এম, এম এস এ এবং মধ্যাহ্ন আহার কর্মসূচী ইত্যাদি। অথচ এদের অবদানই আমাদের মানব উন্নয়নসূচক বাড়াতে সাহায্য করে।

এ ধরনের প্রকল্প শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যা দেশের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অথবা উপজাতি অঞ্চলে কাজ করছে। এদের মধ্যে কোন কোন প্রকল্পে কর্মরতরা যেমন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মচারীরা অনেক রাজ্যে সুসংগঠিত এবং তারা তাদের দাবি আদায়ের পক্ষে জঙ্গি আন্দোলন সংগঠিত করছে। তেমনি আশা এবং মিড-ডে-মিল কর্মীরাও অনেক রাজ্যে সংগঠিত হচ্ছে।

তাদের কাজের প্রকৃতির জন্যই এসব কর্মীরা শোষিত এবং সামাজিকভাবে নিম্নস্তরের জনগণ, কৃষক, কৃষি শ্রমিক এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সাথে ওত্প্রোতভাবে যুক্ত। বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে এসমস্ত প্রকল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করা এবং প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের উন্নত রাজনৈতিক চেতনা আমাদের কর্মসূচী এবং নীতি গ্রহণ ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং বৃহত্তর জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেবার কাজে সহায়ক হয়েছে।

মধ্যবিত্ত কর্মচারী

বেতন ভাতা খাতে ব্যয় কমানোর জন্য কর্মচারীর সংখ্যা ভয়ানকভাবে কমিয়ে দেয়া নয়া উদারবাদি নীতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে ব্যাঙ্ক, বীমা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী দপ্তর এবং রেলওয়ে ইত্যাদিতে কর্মরতদের উপর কাজের চাপ ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। 'আধিকারিক' এবং পরিচালক, যাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নেই, এ ধরনের কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্ক শিল্পে আধিকারিক এবং করণিকের অনুপাত ৩:১ এ এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রম আইন এড়ানোর উদ্দেশ্যে কাজের নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে। 'সেলস্ একজেকিউটিভের' বদলে 'সেলস্' 'পারসনের' সংখ্যা বাড়ছে। কর্মচারীরা যাতে সংগঠিত হতে না পারে, তার জন্যও এ ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

কাজের নিরাপত্তার অভাব এবং কিছু কিছু বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত উচ্চশিক্ষিত গুণমান সম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেতনধারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা চাকুরি থেকে অন্য চাকুরিতে বা সংস্থাতে সরে যাওয়া মোটামুটি একটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। যা হোক, লক্ষপূরণ করার জন্য কাজের চাপ ভয়ানকভাবে বেড়েছে এবং এ ধরনের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য দেখানোর ব্যবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে এক সঙ্গে বিভিন্ন কাজ করানোর ব্যবস্থা চালু হয়েছে এজন্য নূতন নিয়োগের সময় ব্যাঙ্কের কাজের সম্প্রসারণ তথা প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির কাজ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে করানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, স্টেটব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ঋণ প্রদানে চূড়ান্ত নিস্পত্তির কাছ ছাড়া বাকি সমস্ত কাজ রিলায়েন্স ফিনান্স এর মাধ্যমে আউটসোর্সিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে স্থায়ী কর্মচারী কমানোর লক্ষেই এধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

ভালো বেতন ও কাজের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও আবাসন, স্বাস্থ্যের বেসরকারি পরিষেবা এবং শিক্ষার ব্যয় প্রচন্ডভাবে বেড়ে যাওয়ায় এসব এই স্তরের কর্মচারীদের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া নাগরিক পরিষেবা, যেমন বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। বিরাট বিরাট দুর্নীতির কেলেঙ্কারির জন্য ও তারা উদ্বিগ্ন। যাহোক, আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এসব বিষয়গুলিকে নয়া উদারবাদি নীতির সাথে যুক্ত করা এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই এ সামিল হবার জন্য জনগণকে বোঝানো।

তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্র

আই টি এবং আই টি ই এস (তথ্য প্রযুক্তি) ক্ষেত্রে কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে। মাত্র একটা অল্প সংখ্যক কর্মচারী উচ্চ বেতন পায় এবং বাকিদের বেতন খুবই কম। এমন কি এই উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীরাও একই ধরনের কাজে যুক্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির কর্মচারীদের বেতনের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র বেতন পায়। তাছাড়া কোম্পানির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের বিল তৈরি হয় তাতে কর্মচারীদের অংশ মাত্র ১০ শতাংশ। এ সমস্ত কর্মচারীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হয় এবং লক্ষ পূরণের জন্য প্রচন্ড চাপের মধ্যে থাকতে হয়। তার সাথে সাথে নিয়মিতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কম বেতনের কর্মচারীদের পারদর্শিতার মাপকাঠি বদলানো হচ্ছে। কর্মচারী এবং কম্পিউটার এই উভয়কেই উৎপাদনের অঙ্গ (রিসোর্স) হিসাবে বিবেচনা করায় কর্মচারীদের মধ্যে একটা মনোবৈজ্ঞানিক ধারনার সৃষ্টি হয়েছে সে যন্ত্র ব্যবহার করে তারই তারা ঘনিষ্ঠ অংশ বলে নিজেদের মনে করতে শুরু করেছে।

তবে এসব তথ্য প্রযুক্তির কর্মচারীরা সাধারণভাবে নিজেদের অন্যান্য কর্মচারীর সমপর্যায়ভুক্ত বলে নিজেদের মনে করে না। তুলনামূলক ভালো বেতন এবং কাজের উন্নত পরিবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে শোষণকে আড়াল করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে নয়া উদারবাদ সম্পর্কে একটা মোহজাল সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণভাবে তারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বিমুখ। কাজের স্থান পরিবর্তন এবং ব্যক্তিগত দরকষাকষিকেই তারা ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগঠিত আন্দোলনের চেয়ে বেশি ভালো বলে মনে করে।

কিন্তু বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে, বিশ্বব্যাপী সংকটের কারণে তাদের অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন। এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কমে গেছে। নিযুক্তির বিষয়টি অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছে। কারণ প্রযুক্তির পুনর্গঠনের ফলে উন্নত দক্ষতার কাজগুলি উন্নত দেশে আর নিম্ন

দক্ষতার কাজ ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনস প্রভৃতিদেশে যে সস্তায় শ্রমিক পাওয়া যায় সেখানে চলে যাচ্ছে। বেতন বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে এমন কি গত বছরে মুনাফার হার কম হবার কারণে কোন কোন কোম্পানিতে বেতন বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে গেছে। বেতনের ক্ষয় পূরণ এবং কর্মচারীদের দরকষাকষির ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ভারতের সেরা কোম্পানিগুলি মিলে একটা জোট তৈরি করেছে এবং তারা নিজ নিজ সংস্থার কর্মচারীদের সম্পর্কে তথ্যের আদান প্রদান করে। এর ফলে ভবিষ্যতে কর্মচারীদের পক্ষে ব্যক্তিগত দরকষাকষির ক্ষমতা কমে যেতে বাধ্য। তথ্য প্রযুক্তির অনেক কর্মচারী এখন দরকষাকষির চেয়ে নিজ নিজ চাকুরি বাঁচানোর জন্যই বেশি চিন্তিত।

কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ার প্রচারের ফলে তথ্য প্রযুক্তির নূতন কর্মচারীরা প্রচারিত সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রভাবে প্রভাবিত। সাধারণভাবে তারা বামপন্থী নীতি আদর্শকে সেকেলে ও অচল বলে মনে করে।

মহিলা শ্রমিক

গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের জন্য কাজের পরিমাণ কমে যাবার ফলে শ্রমের বাজারে মহিলাদের অংশীদারি কমে গেছে যা শহরের কাজের পরিমাণ দিয়ে পূরণ হচ্ছে না। একমাত্র গৃহ পরিচারিকা এবং নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রেই মহিলাদের সংখ্যা বেড়েছে। আই এল ও-র রিপোর্ট অনুযায়ী সমস্ত বয়সী এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত সমস্ত স্তরের মহিলাদের ক্ষেত্রেই শহর ও গ্রাম উভয়েতেই মহিলাদের কাজ কমে গেছে।

প্রায় ৯৬ শতাংশ মহিলা অসংগঠিত কাজের সাথে যুক্ত। লক্ষ লক্ষ মহিলা ঘরে বসে কাজ করা শ্রমিক হিসাবে শত শত ধরনের কাজ করছে। প্রকল্পগুলিতে বেশিরভাগ মহিলারাই কর্মরত। কোন আইন দ্বারা তারা সুরক্ষিত নয়। কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর হিংসাত্মক ঘটনাক্রম বর্দ্ধমান।

যদিও মহিলা শ্রমিকদের সংখ্যা কমে গেছে, তবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সংগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন কারণে তাদের উপস্থিতি বেশি বেশি করে দেখা যাচ্ছে।

কমবয়সী শ্রমিক

দেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কম বয়সী শ্রমিকরা দেশের মোট শ্রম শক্তির মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাক্সকন নোকিয়া, মারুতি, টয়োটা ইত্যাদির মতো উচ্চ প্রযুক্তির আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতেও তা দেখা যায়। বেসরকারি সংস্থা নিয়ন্ত্রিত সংগঠিত সংস্থাগুলিতে নূতন নূতন যে নিয়োগ সম্পর্ক গড়ে উঠছে তারফলে কম বয়সী শ্রমিকদের বেশিরভাগই ভয়াবহ শোষণের শিকারে পরিণত। এইসব শিল্প কারখানা চুক্তি শ্রমিক, শিক্ষানবীশ কিংবা শিক্ষার্থী ইত্যাদি নামে বিশাল সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করছে এবং খুব অল্প সংখ্যায় স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করছে। অথচ এরা সবাই একই ধরনের কাজের সাথে যুক্ত।

এমন কম বয়সী শ্রমিকদের কাজের প্রতি মনোভাব, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি ধারণা,

আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি এবং যেভাবে তারা অবসর বিনোদন করে এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলে, তা পুরনো শ্রমিকদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে স্মার্ট ফোন এবং সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার ব্যাপক।

এদের মধ্যে ছোট একটা অংশ আছে যারা উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ প্রযুক্তির গুণসম্পন্ন এবং যারা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান তাদের মধ্যে কাজের নিরাপত্তা নিয়ে কোন চিন্তা নেই। তারা প্রতিনিয়ত নূতন নূতন কাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে এবং এতেই তাদের তৃপ্তি। মাঝে মাঝে কখনো কাজ চলে গেলেও তারা চিন্তিত নয়। তাদের অনেকেই মনে করে, বিশ্বায়ন তাদের নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী ভালো কাজ বেছে নেবার সুযোগ করে দিয়েছে। তবে বেশির ভাগ কম বয়সী শ্রমিকদের অবস্থা এরকম নয়। বেশির ভাগ শ্রমিক, এমন কি সংগঠিত ক্ষেত্রেও, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছে, যারা উন্নত শিক্ষার সুযোগ পায় নি, তারা কম বেতনের কাজগুলিতে যুক্ত হচ্ছে এবং সামাজিক সুরক্ষাজনিত কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। দেশের মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৯৪ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত এবং এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কম বয়সী শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত।

একটা সাধারণ ধারণা আছে যে কম বয়সী শ্রমিকরা যারা শিক্ষিত, উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন, আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির সংস্থায় যারা কর্মরত এবং তুলনামূলক ভালো বেতন পায় তারা ট্রেড ইউনিয়ন এবং আন্দোলন সংগ্রামে আগ্রহী নয়। নয়া উদারবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির সে সংস্কৃতি সম্মিলিত কাজকে পছন্দ করেনা সেই সংস্কৃতির প্রভাবে কম বয়সি শ্রমিকরা প্রভাবিত একথা হয়তো সত্য। কিন্তু একথাও সত্য যে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে দেখা গেছে এসব কম বয়সি শ্রমিকরা যারা বহুজাতিক কোম্পানির উৎপাদন শিল্প কারখানাসহ বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় কাজ করে তারা পরিচালন সংস্থার কোন কোন সিদ্ধান্ত যা তারা অনৈতিক বলে মনে করে তার বিরুদ্ধে ঝটিতি ধর্মঘটে সামিল হচ্ছে। এমন আরও উদাহরণ আছে যেখানে মারুতিসুজুকি, হুণ্ডাই, নোকিয়া বা ফকসকনের মতো সংস্থাগুলির কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েও নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াই এ সামিল হচ্ছে। যে আশা নিয়ে তারা চাকুরিতে যোগ দিয়েছিল কাজের জায়গায় কর্তৃপক্ষের আচরণের ফলে অচিরেই তাদের সেই মোহভঙ্গ হচ্ছে এবং দেখা গেছে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক নিয়োগ সম্পর্কের বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে। নানা স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনের ঘটনা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অস্থিরতা বাড়ার মধ্য দিয়েই তার প্রতিফলন ঘটছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন তাদের কাছে পৌঁছাতে বা তাদের সংগঠিত করতে এখনও পারেনি। ট্রেড ইউনিয়নের পুরোনো ধরনের সাংগঠনিক কাজ এ সমস্ত শ্রমিকদের কাছে গুরুত্বহীন। কাজেই যারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী তাদের বুদ্ধিগতভাবে রাজনৈতিকভাবে এবং সংগঠনগতভাবে নিজেদের তৈরি করে নিতে হবে। যথোপযুক্ত

কাজের পদ্ধতি তাদের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা থেকেও শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুত না হয়ে এদের মধ্যে কাজ করতে হবে। এ কাজের জন্য তরুণকর্মী প্রয়োজন। যদি আমরা এব্যাপরে হস্তক্ষেপ করতে ব্যর্থ হই তবে কমবয়সি শ্রমিকরা প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভিন্ন পশ্চাদমুখী আদর্শের কবলে গিয়ে পড়বে।

ইউনিয়নের অবস্থা

নয়াউদারবাদি জমানায় বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকসহ অন্যান্য শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজ ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছে চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু দাক্ষিণ্য দেখিয়ে নিয়োগ কর্তারা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে। দেশের শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশের সরকারই নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। দেখা গেছে সংগঠিত ক্ষেত্রে মাত্র এক তৃতীয়াংশ শ্রমিক সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়নের কাজে অংশ নিতে পারছে। ২০০৪- ০৫ সালে মোট শ্রমিকের ৩৬.২ শতাংশ শ্রমিক তাদের নিজ সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে বলে জানতো, কিন্তু ২০১১-১২ সালে সেই সংখ্যা কমে ৩১.৫ শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে। এমন কি ২০১১-১২ সালে স্থায়ী শ্রমিকদেরও মাত্র ৩৪.৫ শতাংশ জানতো যে তাদের সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আবার যে সমস্ত শ্রমিক তাদের সংস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন আছে বলে জানতো এবং সেখানে ২০০৪-০৫ সালে সেই শ্রমিকদের ৭৬ শতাংশ শ্রমিক যে কোন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল। কিন্তু ২০১১-১২ সালে সেই সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৬৬.৩ শতাংশ।

নয়া উদারবাদি নীতি ট্রেড ইউনিয়নের একাংশের নেতৃত্বকেও মোহগ্রস্থ করেছে এবং তাদের মধ্যে সুবিধাবাদী ঝোঁকের জন্ম দিয়েছে। বামপন্থী নীতি আদর্শে পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বের মধ্যে ও নয়া উদারবাদি জমানা সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছে বলে বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে উদ্যোগের অভাব, নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিয়েছে এবং শিল্প সমস্যায় যথাসময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়ার প্রশ্নে কোন কোন ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীকে মতাদর্শগতভাবে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করে তোলার প্রশ্নে পার্টি এবং বাম আদর্শে পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত দুর্বল।

১৫. এই সময়ে যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিন্তু অগ্রগতি দেখা গেছে। বিগত পাঁচ বছর সময়ে আই এন টি ইউ সি ও বি এম এস সহ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি যৌথভাবে দেশব্যাপী ধর্মঘটসহ প্রচার ও লড়াই সামিল হয়েছে। এখন বিলগ্নিকরণ, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ইত্যাদি দাবি নিয়ে মোট এগারটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নই যৌথ প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৬. নয়া উদারবাদি বিশ্বায়নের এই যুগে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের অবস্থা যে আলোচনা হলো, তাতে দেখা যায় পুঁজিবাদী আক্রমণের বাধা ছক সর্বত্র একভাবে ক্রিয়াশীল নয়। পুঁজির

আক্রমণের সাধারণ চরিত্রের মধ্যেও দুটি বিষয় লক্ষণীয়ভাবে ধরা পড়ে। কাজের সময় বাড়ানো এবং প্রচন্ডভাবে কাজের চাপ বাড়ানো এগুলি সবক্ষেত্রেই চালু আছে। তার সাথে সাথে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত কর্মচারীর বেতনের বিশাল বৃদ্ধি ঘটেছে কিন্তু বিরাট সংখ্যক শ্রমিকের মজুরি কমে যাচ্ছে অথবা স্থির হয়ে আছে। একথা সত্য যে ভারতের সংগঠিত কারখানাতে শ্রমিকভিত্তিক প্রকৃত মজুরি কিংবা শ্রম দিবস বিগত দুদশকে বাড়েনি। ১৯৯০ -এর দশকের তুলনাতেও তা কমে গেছে। এই মজুরির স্তরকেও উচ্চ বলে ধরা যায় না। ২০১১-১২ সালে তা প্রতি শ্রমিক ও প্রতিমাসভিত্তিক ছিল ৮,০০০ টাকা এবং কর্পোরেট (সরকারি কেন্দ্রসহ) নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় ১০,০০০ টাকার কাছাকাছি এবং অংশীদারি অথবা ব্যক্তি মালিকানাধীন কারখানায় তা ছিল ৪০০০ টাকা। কোম্পানি বহির্ভূত সংস্থায় যাদের কাজের প্রয়োজনে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করা হতো তাদেরও গড়ে শ্রমিক মজুরি ছিল ৪০০০ টাকা।

মজুরি কমে যাওয়া, কাজে নিযুক্তির অনিশ্চয়তা, কাজের খাতিরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া এবং সরকারি গৃহীত সামাজিক পরিষেবা কমিয়ে দেয়া কিংবা বিধি নিষেধ প্রয়োগ করা ইত্যাদির কারণে শ্রমজীবীদের সংসার নির্বাহ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এ সমস্ত কোন কোন ক্ষেত্রে খরচ বেড়ে যাওয়া, কম মজুরির আয় ইত্যাদির জন্য বিভিন্নভাবে তারা উপার্জনের সন্ধান করছে এবং এমনকি মহিলারা বিনা পারিশ্রমিকদের কাজেও যুক্ত হচ্ছে। এভাবে শিল্প কারখানায় মজুরিভিত্তিক নিযুক্তির বাইরের শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহ করা এবং অন্যান্য সামাজিক পরিসেবাগুলি ভোগ করা সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশকে সংগঠিত করার সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় আনতে হবে। যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ শিল্প উৎপাদন সংস্থায়, বাইরে অন্যত্র শ্রমিক হিসাবে কাজও করে যারা মজুরি শ্রমিক বলে গণ্য হতে পারে।

১৭. শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন

শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শ ও সংস্কৃতি যা শ্রেণীর অভ্যন্তরে চেতনায় বিরাজমান রয়েছে তাকে আরও শক্তিশালী করার প্রশ্নে উর্বরভূমি তৈরি করেছে। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত দৃশ্য প্রচার মাধ্যম শ্রমিকশ্রেণীর অংশকে মতাদর্শগত ও সংস্কৃতির চর্চায় প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত সাফল্যকে সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সাফল্য, বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে সাফল্যের চেয়ে মহীয়ান করে দেখানো হচ্ছে। এই অবস্থা শ্রমিকশ্রেণীর একাংশ, বিশেষ করে শিক্ষিত ও যুবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীও যারা ব্যক্তি সাফল্যকে বড় বলে বিশ্বাস করে এবং যারা ট্রেড ইউনিয়নের কাজে খুব একটা আগ্রহী নয়, সেই অংশের মধ্যে একটা মোহ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের উচ্চ বেতনধারী কর্মচারীদের অবসর বিনোদন এবং ভোগের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে জাত-পাত, ধর্ম এবং একে ভিত্তি করে পরিচিতিভিত্তিক সংগঠন গড়ে উঠছে যা শ্রেণীঐক্যকে আঘাত করছে। মধ্যবিত্ত শ্রমিক কর্মচারীদের একাংশ যারা আর্থিক ক্ষেত্রে কর্মরত,

তারা বেসরকারিকরণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে লড়াই আন্দোলনে শামিল হচ্ছে, কিন্তু তারাও নয়া উদারবাদী নীতির সার্বিক প্রভাবকে উপলব্ধি করতে আগ্রহী নয়।

১৮. শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে প্রগতিশীল অগ্রগতি ঘটানোর প্রশ্নে এ ধরনের বিকৃত ঝোঁকের মোকাবিলা করতেই হবে। এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের ঝোঁকের একমাত্র শক্তিশালী প্রতিরোধ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সংগ্রামকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি। এই অবস্থার উপরই নির্ভর করছে আন্দোলনের ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণীর চেতনার মধ্যে যে ধরনের প্রকাশই ঘটুক না কেন, নিহিত বাস্তব সত্য হচ্ছে তাদের উপর নিপীড়ন ও শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং এর বিপরীতে বাঁচার জন্য অবিরাম সংগ্রাম। এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আকাঙ্খার বৃদ্ধি ঘটলেও সেই আকাঙ্খা পূরণ হওয়া তাদের সাধ্যের বাইরে। এই দ্বন্দ্ব শ্রমিকশ্রেণী এবং পুঁজির ভয়াবহতার প্রতি শত্রুতার জন্ম দিতে বাধ্য। পুঁজিবাদী স্বেচ্ছাচার সাময়িককালের জন্য হয়তো সেই শত্রুতাকে প্রকাশ্যভাবে মোকাবিলা করতে পারে কিংবা একে ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হতে পারে। কিন্তু পরিণতিতে শ্রেণী শোষণ এবং এর বিরুদ্ধে শ্রেণী ঐক্য ও প্রতিরোধ গড়ে উঠতে বাধ্য। এই কাজ করার জন্য আমাদের পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে হস্তক্ষেপ করার যথোপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করতে হবে, যা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই আবেগ ও অনুভূতিকে প্রকাশ্যে এনে তাকে পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কার্যকরী লড়াই গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, এই অবস্থার দুটো দিক আছে, একদিকে তা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তোলার প্রশ্নে সমস্যার সৃষ্টি করেছে কিন্তু অন্যদিকে আবার এর মধ্যেই একটা বিরাট সম্ভাবনা নিহিত আছে।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে প্রচণ্ড, অসামঞ্জস্যতা রয়েছে এবং তা ক্ষণস্থায়ী নয় বরং তা ভারতীয় পুঁজিবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং একই কারণে আমরা যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় কথা বলি, তখন কি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গড়ে ওঠা নেতৃত্বের কথা ভাববো না। বিভিন্ন অবস্থাতে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যে বিভিন্নতা আছে, সেই পরিস্থিতিতে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে সর্বত্র একই মানের বিপ্লবী শ্রেণীচেতনা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিরাজ করছেনা। বিভিন্ন কারণেই তথ্য- প্রযুক্তিসহ অস্থায়ী শ্রমিক যাদের কাজের কোন সুনির্দিষ্ট জায়গা নেই তাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতা সৃষ্টি করা অনেক দূরের বিষয়, যা তুলনায় প্রকৃত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে গড়ে তোলা সহজতর। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ভূমিকা তাদের শ্রেণীগত সংখ্যার কারণে অথবা তাদের মধ্যে পুঁজির শোষণের বিরোধী ঝোঁকের কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

অসংগঠিত শ্রমিকদের তুলনায় শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকশ্রেণী বেশি মজুরি পাওয়া সত্ত্বেও তারা উৎপাদন অধিক করার চাপের কারণে সর্বোচ্চ মাত্রায় শোষণের শিকার। তারা

উৎপাদন ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়তার মাত্রা বেড়ে যাবার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ করছে কিভাবে মানুষ ধীরে ধীরে যন্ত্রের হাতে পুতুলে পরিণত হচ্ছে। এইক্ষেত্রের শ্রমিকশ্রেণীর খণ্ডক্ষুদ্র হয়ে যাবার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রে ভিড় বাড়াচ্ছে। এ ধরনের শ্রমিকশ্রেণী ৭০ শতাংশ কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত কারখানায় কাজ করে। তার অর্থ হচ্ছে তারা শুধুমাত্র একই কারখানায় কেন্দ্রীভূতভাবে কাজ করছে না, তাদের প্রতিটি কেন্দ্রীভূত গোষ্ঠী পুঁজিসৃষ্ট শ্রমিকশ্রেণীর আরও বিশাল কেন্দ্রীভূত অবস্থার অংশ। কারণ অনেক কোম্পানিরই বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানা রয়েছে এবং ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিশাল সংখ্যার কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করে (ব্যবসায়ীগোষ্ঠী) ও সে সমস্ত কোম্পানিতে শিল্প বহির্ভূত কাজ হয় সেই অখণ্ড সংস্থায় আরও বেশি সংখ্যায় তারা যুক্ত হচ্ছে। তার উপরে রয়েছে ভারতে বহুজাতিক সংস্থার উপস্থিতি। বিভিন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিকিকরণ এবং বিশ্ব উৎপাদন জালের সাথে যুক্ত হবার কারণে ও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী দেশের সীমানা বাইরের শ্রমিকশ্রেণীর কেন্দ্রীভবনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে।

বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ২০০৮ এর সংকট থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি পাবার মতো লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা এবং ভারতীয় অর্থনীতি প্রাথমিকভাবে সেই ঝড় থেকে নিস্তার পেলেও বর্তমানে প্রবৃদ্ধি এবং সঞ্চয় দুই-ই ক্রমশ কমছে, পাশাপাশি মুনাফার হার ও কমার স্তরে প্রবেশ করেছে। অর্থনীতির বৃহত্তর পরিসরে এই সংকটের অর্থ হচ্ছে দেশের রাজস্ব নীতিতে পুঁজির স্বার্থ ও শ্রমজীবী মানুষ এই উভয়ের স্বার্থরক্ষা করার প্রশ্নটি বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং পরিণামে শ্রমজীবীদের ইতোমধ্যেই চলা অনিশ্চিত অবস্থাকে আরও অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে। সাথে সাথে বেসরকারি বিনিয়োগকারী ও বৈদেশিক পুঁজির আগ্রহকে আরও বাড়াবার জন্য আরও সংস্কারের দিকে জোর দেয়া হবে। উৎপাদন শিল্প সংস্থায় সংকট গভীরতর হয়েছে তাই পুঁজিপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর বিনিময়ে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করবে। এমনকি নির্মাণ শিল্প, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর কেন্দ্রীভবন বেশি, সেখানেও সংকট দেখা দিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটাই অনিবার্য যে আগামীদিনে পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হবে। এই দ্বন্দ্ব একদিকে শিল্প উৎপাদন সংস্থাগুলিতে হবে তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে সমাজের বৃহত্তর পরিসরেও দেখা দেবে।

বর্তমান যে সম্ভাবনা আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার এবং নয়া উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম শক্তিশালী করার প্রশ্নে পার্টি এবং পার্টির নেতৃত্বে চলা ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পরিচালনা করার জন্য যথাযথ রণকৌশল নির্ধারণ করার কাজ করতে হবে।

১৯. পরামর্শ

— নয়া উদারবাদি নীতির অশুভ প্রভাব সম্পর্কে আদর্শগত শিক্ষা এবং আমাদের কর্মীদের মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই আন্দোলন গড়ে তোলা

বেসরকারি ক্ষেত্রসহ গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ উন্নত শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত

করার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেয়া

— যৌথ ট্রেড ইউনিয়ন প্রচার ও সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পার্টি প্রভাব বাড়ানো যাবে এ বিষয়ে পার্টি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নির্দেশনা দেয়া

— পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের যৌথ লড়াইয়ে বিকশিত করা

—কাজের ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় যেমন শ্রমিকদের সম্পর্কিত স্বাস্থ্য, শিল্প, আবাসন এবং তাদের আবাসন এলাকার সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি নিয়ে আমাদের নেতৃত্বাধীন শ্রমিক সংগঠনগুলিকে লড়াই আন্দোলন গড়ে তুলতে নির্দেশনা

— কম বয়সী শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া

—প্রচার আন্দোলনের সময় জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে ব্যবহার করা

সংযোজনী

ভারতের শ্রমিকশ্রেণী : পরিসংখ্যানগতভাবে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬৮ তম রিপোর্ট অনুযায়ী (২০১১-২০১২) ভারতে শ্রমশক্তির সংখ্যা ৪৮ কোটি ৪ লক্ষ এবং এর মধ্যে কাজ করতে পারে এমন সংখ্যা হচ্ছে ৪ কোটি ৩ লক্ষ। কর্মক্ষম বয়সের হিসাবে এই সংখ্যা আরও বেশি ৭৫ কোটির উপরে।

১৯৯০ এর আগে যখন শ্রমশক্তি ৬১% কৃষিখাতে যুক্ত ছিল। সে জায়গায় ২০০১-১২ সে সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে। (যদিও জনগণনার হিসাব অনুযায়ী কৃষিকাজে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কিছু বেশি তবুও জনগণনাতেও কমে যাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যখন দেখা যায় যে ২০০১-২০১১ এই সময় পর্বে কৃষক এবং কৃষিজীবীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ কমে গেছে। প্রায় ২৪ কোটি ২০ লক্ষ শ্রমিক অকৃষি কাজের সাথে যুক্ত (১১ কোটি ৫০ লক্ষ শিল্পসহ অন্যান্য উৎপাদনমূলক কাজ এবং ১২ কোটি ৭০ লক্ষ পরিষেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত)। বিভিন্ন পেশায় যুক্তদের মধ্যে যুক্ত মোট ৫ কোটি শ্রমিকের মধ্যে ১১% শ্রমশক্তি একমাত্র নির্মাণ কাজের সাথেই যুক্ত। অথচ ১৯৯০ এর দশকে এই নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমশক্তির সংখ্যা ছিল ৪% এর কম। কিন্তু বর্তমানে এই কাজে নিযুক্তির পরিমাণ প্রায় উৎপাদন শিল্পে নিযুক্তির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এর উপর বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কম পক্ষে ১ কোটি ৬০ লক্ষ -১ কোটি ৭০ লক্ষ শ্রমিক নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত উৎপাদন ও শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের চেয়ে সংখ্যাগতভাবে বেশি।

যেখানে শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমিক নিয়মিত মজুরি ও বেতনপ্রাপ্ত হিসাবে নিযুক্ত সেখানে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ শ্রমিক হচ্ছে ক্যাজুয়েল বা সাময়িক (এই ক্ষেত্রে যুক্ত মোট ১২ কোটি ৬০ লক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ নিযুক্ত শ্রমিকের প্রায় কাছাকাছি)। এই নিয়মিত মজুরিতে ও বেতনপ্রাপ্ত নিযুক্তির মধ্যে ভি ডি

টির পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে এর মধ্যে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত যা ১৯৯১ সালের সংখ্যার সাথে মিলেনা। (১৯৯১ সালে সেই সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭০ লক্ষ) লক্ষণীয় যে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগের অংশীদারির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারি ক্ষেত্রের নিযুক্তি যা ১৯৯১ সালে ২ কোটি ছিল ২০১২ সালে তা কমে গিয়ে হয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ ৬০ হাজার। অন্যদিকে বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রের নিযুক্তি ৮০ লক্ষ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২১ লক্ষ। সরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদন শিল্পেই নিযুক্তি সবচেয়ে বেশি কমেছে। যা ছিল ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার তা কমে হয়েছে ১০ লক্ষ ৭ হাজার। অন্যদিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যায় নিযুক্তির মধ্যে বেশিরভাগ নিযুক্তি উৎপাদন বহির্ভূত পরিষেবাতে। ১৯৯১ থেকে ২০০২ এই সময়ে বেসরকারি ক্ষেত্রে সেখানে নিযুক্তি বেড়েছে ৪০ লক্ষ কিন্তু এর মধ্যে উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ।

ডি জি ই টি পরিসংখ্যান একদিকে শুধুমাত্র মজুরিভিত্তিক নিযুক্তিকেই যুক্ত করেনি। এর সাথে বাবুশ্রেণীর বেতন প্রাপ্তদেরও যুক্ত করেছে। কিন্তু অন্যদিকে এই পরিসংখ্যানের মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রের সমস্ত নিযুক্তি স্থান পায়নি। কারণ এই ডি জি ই টি সব সময়েই নির্মাণ কাজে যুক্ত এবং ক্রমবর্দ্ধমান নিয়মিত শ্রমিকদের সংখ্যাকে তাদের সমীক্ষার মধ্যে ধরেনা। এই ভাবে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৫০ হাজার শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে অর্ধেকের কিছু কম নির্মাণ শ্রমিক যেখানে এন এস এস (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা) এর পরিসংখ্যা) অনুযায়ী সংগঠিত ক্ষেত্রে একই ধরনের কাজে কর্মরতদের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ্যেরও বেশি (যদিও এদের নিযুক্তি বিধিবদ্ধ ভাবে নাও হতে পারে। কিন্তু নিয়োগ কর্তা সংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত)। একইভাবে ডিজিইটির তথ্য অনুযায়ী উৎপাদন শিল্পে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা সেখানে ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার বলা হয়েছে সেখানে এ এস আই (ASI) এর তথ্য অনুযায়ী সংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন কারখানাতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার শ্রমিক কাজ করে যার মধ্যে ১ কোটি ৪৪ হাজার মানুষকে শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

নির্মাণ ক্ষেত্র ছাড়া কোম্পানি বহির্ভুত অকৃষির সাথে যুক্ত নির্মাণগুলিতে এন এস এসও এ বৈঠকের তথ্য অনুযায়ী ২ কোটি ৭০ লক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী নিযুক্ত (হায়ার্ড) হিসেবে কাজ করে। যার মধ্যে উৎপাদন শিল্পে রয়েছে ১ কোটি ৪ হাজার, ব্যবসাতে রয়েছে ৬০ লক্ষ এবং অন্যান্য পরিষেবাতে ১ কোটি ৬ হাজার শ্রমিক। ২০১১-১২ সালে (এন এস এসও ৬৮ তম বৈঠক) নিয়মিত নিযুক্ত কর্মিদের গড় দৈনিক বেতন বা মজুরি ছিল ৩৯৬ টাকা আর অনিয়মিত (ক্যাজুয়েল) শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিল শহরে ১৭০ টাকা এবং গ্রামে ১৩৯ টাকা। (নিয়মিত নিযুক্তদের বেতন মজুরির সাথে উচ্চ বেতনে নিযুক্তদের ধরা হয়েছে) কর্পোরেট বহির্ভুত ও অকৃষি সংস্থাগুলিতে নির্মাণ ক্ষেত্র ছাড়া (এন এস এস ও ৬৭ বৈঠক) প্রত্যেক প্রয়োজন অনুযায়ী নিযুক্ত শ্রমিকের ২০১০-১১ সালে প্রতি মাসে পেতো ৪ হাজার টাকার ও কম। সংগঠিত ক্ষেত্রের কারখানাতে প্রতি শ্রমিকের গড়ে মাসিক মজুরী (এ এস

আই) ২০১১-১২ সালে ছিল ৮ হাজার টাকার কিছু কম। একই সময়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলিতে তা ছিল প্রায় ১১ হাজার টাকা (কারখানা শ্রমিকদের ৩৩ শতাংশ) আর বেসরকারি কারখানাগুলিতে তা ছিল প্রায় ৭৩০০ টাকা (কারখানা শ্রমিকদের ৩৮ শতাংশ) এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বা অংশীদারি সংস্থায় তা ছিল ৪ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকার মাঝামাঝি (কারখানা শ্রমিকদের ২৮ শতাংশ)। বিগত দুই দশক ধরে কারখানা শ্রমিকদের মজুরি প্রকৃত অর্থে স্থির অবস্থায় ছিল। এই অবস্থা প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রেই স্থিতাবস্থা বজায় রাখেনি তার প্রতিফলন দৈনিক কাজের মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। (প্রতিমজুর ভিত্তিক মজুরি)।

তবে, কারখানাগুলিতে কর্মরত শ্রমিক নয় এমন উচ্চ বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অবস্থা একটু ভিন্নতর। এভাবে ১৯৯০ -৯১ এবং ২০১১-১২ এই সময়ে মোট কর্মনিযুক্তদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৭৬ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশ হয়েছে, এই সময়ে সমস্ত নিযুক্তদের মজুরি পরিমাণ ৬৪ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৫০ শতাংশ।

মজুরি স্থির হয়ে থাকার সাথে সাথে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্য যুক্ততায় মজুরির সংকোচন ঘটছে।

মজুরির অংশ কমে যাবার বিষয়টি শুধুমাত্র উৎপাদন ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে না, এই অবস্থা নির্মাণ ক্ষেত্র ও পরিষেবা, বিশেষ করে বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হচ্ছে (এ সি এস ও, ন্যাশনেল একাউন্টস্ স্টেটিকিস্)। যদি মূল্যযুক্ততার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে বেসরকারি সংগঠিত ক্ষেত্রে বেশি (যা এখন অনুৎপাদন কাজকর্ম থেকে যুক্ত হচ্ছে)— তবে শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরির ক্ষতিপুরণের অংশ ১৯৯০- ৯১ সালের ৫৫ শতাংশ স্তর থেকে তা বর্তমানে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। এতদ্সত্ত্বেও বিগত দুই দশকে কিছু কিছু কর্মচারীর বেতন ক্ষতিপূরণ হিসাবে অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়েছে। (উইপ্রো সংস্থায় ২০১১-১২ সালে উপরের স্তরের ১০৩ জন কর্মচারীর বেতন মাসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ছিল, যার মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২ লক্ষ এবং সর্বনিম্ন ৫ লক্ষ ছিল।)

আরেকটা উল্লেখ্যনীয় বিষয় হচ্ছে উৎপাদন কেন্দ্রের অবস্থানের কারণে সংগঠিত উৎপাদন ক্ষেত্র 'গ্রামীণ' চেহারা নিচ্ছে। ২০১১-১ গ্রামাঞ্চলে স্থিত কারখানার ছিল সংখ্যায় বেশি, যে গুলিতে শহর অঞ্চলের তুলনায় বেশি পুঁজি বিনিয়োগ হয়েছে এবং উৎপাদনও বেশি হচ্ছে। ৪৪ শতাংশ কারখানা নিযুক্তির মধ্যে ৫৬ শতাংশ হয়েছে স্থির পুঁজিতে এবং কারখানার সার্বিক মূল্যযুক্তিতায় তা ৫৩ শতাংশ। প্রতি কারখানাপিছু শ্রমিকনিযুক্তি ছিল ৫৬ , যা শহরাঞ্চলের কারখানার ক্ষেত্রে ছিল ৪৩। অবশ্য মজুরির প্রশ্নে গ্রামীণ এলাকার চেয়ে শহরাঞ্চলের শ্রমিকরা বেশি মজুরি পেতো (গ্রামে প্রতিমাসে ৭ হাজার ২০০ টাকা আর শহরে ৮ হাজার ৫ শত টাকা)। এবং মূল্য যুক্ততার অংশের প্রশ্নেও গ্রামাঞ্চলে তা কম ছিল (গ্রামে ৮.৮৫ শতাংশ তুলনায় শহরে ১৫.৪১ শতাংশ)।